জুমুআর খুতবা

সৈয়দনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) কর্তৃক লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ মসজিদে ১৪ জানুয়ারী, ২০১১-এ প্রদত্ত জুমুআর খুতবা

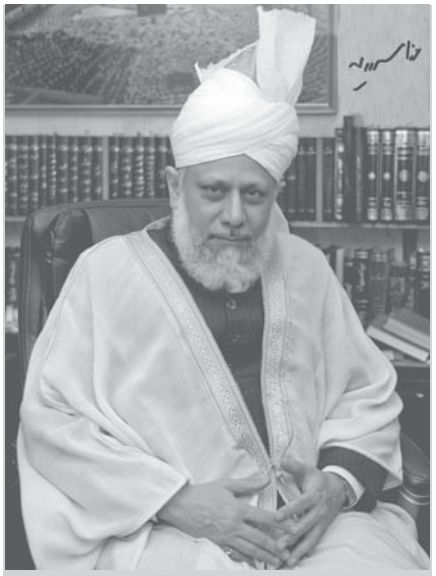

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم*
بسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ * إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ * اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ * صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ آمين

তাশাহ্হুদ, তাউয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযুর (আই.) নিম্নোক্ত আয়াতটি তিলাওয়াত করেন।

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

অর্থাৎ 'তুমি মার্জনার পথ অবলম্বন কর এবং সঙ্গত কাজের আদেশ দাও আর অজ্ঞ লোকদের এড়িয়ে চল।'

(সূরা আল্ আ'রাফ-২০০)

হযরত মুহাম্মদ (সা.) সম্পর্কে -

كان خلقه القرآن

অর্থাৎ 'তাঁর জীবন কুরআন করীমের বিধি-বিধান ও নৈতিকতার মূর্তিমান দৃষ্টান্ত।'

হযরত আয়শা (রা.)-এর এ উক্তিটি নবী করীম (সা.)-এর উত্তম চারিত্রিক গুণাবলীর অসীম সমুদ্রের প্রতি দিক-নির্দেশনা দিয়ে বলছে, যাও! এ সমুদ্র থেকে মূল্যবান মণিমাণিক্য অন্বেষণ কর। মহান চারিত্রিক গুণাবলীর যে কোন মাণিক্যই অন্বেষণ কর না কেন তাতে তোমরা আমার প্রিয় প্রভূ হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সা.)-এর মোহর অঙ্কিত পাবে।

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي

অর্থাৎ আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্মকে পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের প্রতি আমার নেয়ামত পরিপূর্ণ করলাম।

(সূরা আল মায়েদা-৪)।

আল্লাহ্ তাআলার এ বাণীতে খতমে নবুওয়াতের বিশেষ মর্যাদার বিষয়টি আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। অতএব, নবী করীম (সা.)-এর প্রতি শেষ শরীয়ত অবতীর্ণ করার মাধ্যমে আল্লাহ্ তাআলা ধর্ম ও নেয়ামত (বা পুরস্কারের) পূর্ণতা দান করেছেন। কাজেই এই ইলহামী গ্রন্থ ও নিজ প্রভূ-প্রতিপালকের অভিপ্রায় সম্বন্ধে অধিক জ্ঞান তিনি (সা.) ব্যতীত আর কার থাকতে পারে? মহানবী (সা.)-এর জীবনের প্রতিটি আঙ্গিক একদিকে কুরআন করীমের ব্যবহারিক প্রতিরূপ এবং অন্যদিকে আল্লাহ্ তাআলার আদেশ অনুযায়ী আমাদের জন্য সর্বোত্তম জীবনাদর্শ।

এখন আমি আপনাদের সম্মুখে নবী করীম (সা.)-এর পবিত্র জীবনীর সুন্দরতম একটি দিকের এমন কিছু বিষয় তুলে ধরবো যা সৎ প্রকৃতির মানুষকে তাঁর ভালবাসায় আরো বেশি নিমগ্ন করে। এবং মুনাফিকদের নোংরামীকে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখার মাধ্যমে তিনি (সা.) যখন স্বীয় চারিত্রিক গুণাবলী উপস্থাপন করেছেন তখন বিশ্ববাসীর কাছে তাদের (অর্থাৎ মুনাফেকদের) চরিত্র প্রকাশিত হয়েছে। আমি যে মহান চারিত্রিক গুণাবলী সম্বন্ধে আলোচনা করতে চাচ্ছি তা হল, মার্জনা করা।

অপরাধী ধরা পড়ার পরও তাকে শাস্তির পরিবর্তে হযরত রাসূল করীম (সা.) ভালবাসার তীর দিয়ে এমন ভাবে ঘায়েল করতেন যে, সে তাঁর জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করা জন্য প্রস্তুত হয়ে যেত। এমন কি কেউ আছে যে এই অনুগ্রহ ও মার্জনার মোকাবেলা করতে পারে?

আল্লাহ্ তাআলার এ আদেশ সর্বদা আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে, 'মুহাম্মদ (সা.) তোমাদের জন্য সর্বোত্তম জীবনাদর্শ'। কাজেই বর্তমান যুগের মুসলমানদেরও সেই আদর্শের অনুসরণের প্রতি মনোযোগী হওয়া প্রয়োজন। হায়! যদি তারা বুঝত।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন,

'আল্লাহ্ তাআলার নৈকট্য প্রাপ্তদের অনেক গাল-মন্দ করা হয়েছে। অত্যন্ত বর্বরোচিত ভাবে কষ্ট দেয়া হয়েছে। অধিকন্তু তাঁদেরকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে,

أَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

অর্থাৎ অজ্ঞ লোকদের এড়িয়ে চল (সূরা আল্ আ'রাফ-২০০)।

আমাদের নবী ও পূর্ণতম মানব (সা.) কেও জঘন্য পন্থায় কষ্ট দেয়া হয়েছে, গালাগালি করা হয়েছে, কটূকথা শোনানো হয়েছে এবং উত্যক্ত করা হয়েছে। কিন্তু সর্বোত্তম চারিত্রিক গুণাবলীর অধিকারী সত্তা এর বিপরীতে কী করেছেন? কেননা আল্লাহ্ তাআলা অঙ্গিকার করেছেন, তুমি যদি জাহেলদের ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখ তবে তোমার সম্মানকে সমুন্নত রাখব এবং তোমার প্রাণের নিরাপত্তা বিধান করব। দুষ্ট মানুষেরা তোমার চরিত্রের উপর আক্রমণ করতে পারবে না।

বাস্তবেও তেমনই ঘটেছে। বিরোধীরা নবী করীম (সা.)-এর সম্মানে আঁচড়ও কাটতে পারে নি। বরং লাঞ্ছিত ও অপদস্ত হয়ে তারা নবী করীম (সা.)-এর পদতলে ধরাশায়ী হয়েছে অথবা তাঁর (সা.) সম্মুখে নতজানু হয়েছে।'

(রিপোর্ট জলসা সালানা ১৮৯৭ইং, পৃষ্ঠা ৯৯)

বলা সহজ হলেও বাস্তবে নিজের এবং নিজের সাহাবাদের উপর ধারাবাহিক ভাবে নিপীড়ন ও নির্যাতন হতে দেখা এবং পরবর্তীতে পূর্ণ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পর মার্জনা করার এমন দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করা পৃথিবীর সৃষ্টি অবধি আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়নি।

এটা নবী করীম (সা.)-এরই বিশেষ কৃতিত্ব। মুনাফেক ও অপ্রশিক্ষিত মানুষের ক্ষেত্রে যে ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা তিনি প্রদর্শণ করেছেন সেটা কোন সাধারণ বিষয় নয়। নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে দেখলে যে কোন ইতিহাসবিদ ধর্মীয় মতপার্থক্য থাকা সত্ত্বেও এ কথা বলতে বাধ্য, তিনি (সা.) যে সহিষ্ণুতা, ধৈর্য্য ও অন্য প্রতিটি নৈতিক গুণাবলীর দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেছেন তা অতুলনীয়। আর কোন কোন হিন্দু ও খ্রীস্টান লেখক এ কথা লিখেছেনও।

এখন আমি এমন কিছু ঘটনা বর্ণনা করছি যা মহানবী (সা.)-এর মার্জনা করার মহান গুণের প্রতি আলোকপাত করে। প্রথমে আমি মুনাফেকদের সর্দার আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সলূলের ঘটনা বর্ণনা করছি। সে বাহ্যিক ভাবে নবী করীম (সা.)-এর আনুগত্য মেনে নিলেও মহানবী (সা.)-এর ব্যক্তি সত্তার উপর বর্বরোচিত আক্রমণের ক্ষেত্রে কোন সুযোগ হাত ছাড়া করে নি। মদীনায় থাকা অবস্থায় অনবরতই এমন হতো।

নবী করীম (সা.) মদীনায় হিযরতের পূর্বে মদীনাবাসী তাকে তাদের নেতা বনানোর কথা ভাবছিল, এটাই ছিল তার শত্রুতার মূল কারণ। কিন্তু তিনি (সা.)-এর আগমনের পর মদীনার প্রতিটি গোত্র ও ধর্মের লোকেরা যখন মহানবী (সা.)-কে প্রশাসনিক নেতা হিসেবে গ্রহণ করল তখন এ ব্যক্তি বাহ্যিক ভাবে বিরোধিতা না করলেও মনে মনে করেছে। আর তার এই বিরোধিতা উত্তর উত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছিল। তার হিংসা-বিদ্বেষ ও নোংরামীও বৃদ্ধি পাচ্ছিল। হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর মদীনা গমন ও বদরের যুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে একটি ঘটনার বর্ণনা পাওয়া যায়। এ থেকে একদিকে তার হিংসা-বিদ্বেষ আর অন্যদিকে নবী করীম (সা.)-এর ধৈর্য্যশক্তির বিষয়টি প্রকাশ পায়।

এটা আসলে ক্ষমার বহিঃপ্রকাশ ছিল। পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ ও নবী করীম (সা.)-এর ব্যক্ত করা প্রতীক্রিয়া থেকে ক্ষমা করার বিষয়টি আরো বেশি দ্যূতি ছড়ায়। যাইহোক, রেওয়ায়েত আছে যে, ইমাম যোহরী বলেন, উরওয়া বিন যুবায়ের বলেন, উসামা বিন যায়েদ আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, ফিদক অঞ্চলের একটি চাদর জড়িয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) গাধায় চড়ে এবং উসামা বিন যায়েদ (রা.)-কে পিছনে বসিয়ে অসুস্থ সা'দ বিন উবাদাহকে দেখার জন্য বনু হারেস বিন খাযরাজে যাচ্ছিলেন। এটি বদরের যুদ্ধের পূর্বের ঘটনা। যাবার সময় এমন একটি সমাবেশের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন যাতে আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সলূল বসে ছিল। সে তখনও ইসলাম গ্রহণ করেনি।

নবী করীম (সা.) দেখলেন, সমাবেশটিতে মূর্তি পূজারী ও ইহুদিরাও বসে আছে এবং আব্দুল্লাহ্ বিন রাওয়াহাও বসে ছিলেন। এ সমাবেশের লোকদের গায়ে যখন গাধার পায়ের ধূলা উড়ে গিয়ে পড়ল তখন আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সলুল নিজের চাদর দিয়ে তার নাক ঢেকে বলল, আমাদের উপর ধূলা উড়িও না। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) গাধা থেকে নেমে সবাইকে সালাম দিলেন এবং তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন ও কুরআন করীম পাঠ করে শোনালেন।

এ প্রেক্ষিতে আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সলূল বলল, হে মহাশয়! আপনি যে বিষয়ে কথা বলছেন তা কোন ভাল কথা না। আর কথা সঠিক হলেও এ সমাবেশে শুনিয়ে আমাদের কষ্ট দিবেন না। নিজের বাড়িতে যান আর সেখানে যারা আসবে তাদেরকে কুরআন পড়ে শোনান গে, যান। আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সলূলের এ কথা শুনে আব্দুল্লাহ্ বিন রাওয়াহা বললেন, কেন নয়?

হে রাসূলুল্লাহ্! আপনি আমাদের সমাবেশ গুলোতে এসে কুরআন পাঠ করে শোনাবেন, কেননা কুরআন শুনতে আমাদের খুব ভাল লাগে। এ কথা শোনা মাত্রই মুসলমান, মুশরেক ও ইহুদিরা এমন ভাবে বিতর্ক শুরু করল যে একেবারে মারামারির উপক্রম। নবী করীম (সা.) তাদেরকে অনবরত চুপ করাতে থাকলেন। আর তারা শান্ত হওয়ার পর তিনি (সা.) তাঁর বাহনে চড়ে সা'দ বিন উবাদার বাড়ি পৌঁছলেন। তিনি (সা.) সা'দ বিন উবাদাকে জানালেন, আবু হাব্বাবা অর্থাৎ আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সলূল কী কী বলেছে। এ কথা শুনে সা'দ বিন উবাদাহ্ বললেন, হে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) মার্জনা করুন। সেই সত্তার কসম, যিনি আপনার প্রতি এই মহান ধর্মগ্রন্থ কুরআন করীম অবতীর্ণ করেছেন। আল্লাহ্ তা'লা এটিকে আপনার প্রতি অবতীর্ণ করে সত্যকে আনয়ন করেছেন। এই অঞ্চলের অধিবাসীরা এই আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সলূলকে তাদের বাদশাহ বানানোর এবং তার বাহুকে শক্তিশালী করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। আপনার প্রতি আল্লাহ্ তাআলার প্রকৃত সত্যের এই করুণা বর্ষণের ফলে মানুষ তাকে অস্বীকার করে, এতে সে খুব

কষ্ট পায়। এ জন্য সে আপনার সাথে এমন দুর্ব্যবহার করেছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তাকে মার্জনা করেছিলেন কিন্তু তা এ জন্য নয় যে, সা'দ বিন উবাদাহ্ মার্জনা করতে বলেছিলেন। বরং তিনি (সা.) তাঁকে এ কথা বলার উদ্দেশ্য ছিল, সে আজ আমার সাথে এমন মন্দ আচরণ করছে কিন্তু আমি তো তাকে মার্জনা করব। আরো লিখেছেন, আল্লাহ্ তাআলার আদেশ অনুযায়ী তিনি (সা.) এবং তাঁর সাহাবাগণ মুশরেক ও আহলে কিতাবদের সাথে মার্জনাপূর্ণ আচরণ করেছেন। আর তাঁরা তাদের কাছ থেকে পাওয়া দুঃখ-কষ্টে ধৈর্য্য ধারণ করতেন। কিন্তু কিছু কাল পর আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সলূল যখন বাহ্যিক ভাবে মুসলমান হয়ে গেল তখন সে তার কপটতাপূর্ণ আচরণের মাধ্যমে নবী করীম (সা.) কে সর্বদা কষ্ট দেয়ার চেষ্টা করতে থাকল।

জাবের বিন আব্দুল্লাহ্ (রা.) বর্ণনা করেন, তিনি একবার একটি যুদ্ধে গিয়েছিলেন। সেই যুদ্ধে একজন মুহাজের একজন আনসারের পিঠে থাপ্পড় মারে, এতে আনসার লোকটি উচ্চ স্বরে চিৎকার করে বলে, হে আনসারগণ! তোমরা আমাকে সাহায্য কর। অবস্থা বেগতিক দেখে সে মুহাজেরও উচ্চ স্বরে বলে, হে মুহাজেরগণ! তোমরা আমাকে সাহায্য কর। নবী করীম (সা.) এ সব আওয়াজ শুনে জিজ্ঞাসা করলেন, জাহেলিয়াতের যুগের ন্যায় উচ্চ স্বরে চেচামেচি হচ্ছে কেন? উত্তরে নবী করীম (সা.)-কে বলা হল, হে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)! একজন মুহাজের একজন আনসারের পিঠে থাপ্পড় মেরেছে। নবী করীম (সা.) বললেন, তোমরা এমন করা ছেড়ে দাও কেননা এটি একটি মন্দ কাজ। একজন বলে আমি আগে পান করব, আরেক জন বলে আমি আগে পান করব; এভাবেই পানি পান করা নিয়ে ঝগড়াটি শুরু হয়। পরবর্তীতে মুনাফেকদের সর্দার আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সলূল এ বিষয়টি জানার পর বলে, মুহাজেররা এমন করেছে? আল্লাহ্‌র কসম! আমরা যদি মদীনায় ফিরত যেতে পারি তবে মদীনার সম্মানিত ব্যক্তি মদীনার লাঞ্ছিত ব্যক্তিকে (নাউযুবিল্লাহ্) বের করে দেবে। আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সলূলের এ কথা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) জানতে পারলেন। এ কথা শুনে হযরত উমর (রা.) দাঁড়িয়ে বললেন, হে রাসূলুল্লাহ্ ! আপনি আমাকে অনুমতি দিন, আমি তার শিরোচ্ছেদ করব। হযরত উমর (রা.)-এর এ কথা শুনে মহানবী (সা.) বললেন, তাকে ক্ষমা করে দাও। মানুষ যেন এ কথা বলতে শুরু না করে যে, মুহাম্মদ (সা.) তাঁর সঙ্গীদেরও হত্যা করে।

(বুখারী, কিতাবুত্ তফসীর, হাদীস নং ৪৯০৫)

তার এমন আচরণের পরও মহানবী (সা.) তাকে নিজের সঙ্গী বলে সম্বোধন করেছেন। কেননা বাহ্যিক ভাবে সে নিজেকে মুসলমান দাবি করছিল। অন্য এক বর্ণনা থেকে জানা যায়, নবী করীম (সা.) আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সলূল ও তার সাথীদের ডেকে এনে জিজ্ঞাসা করেন, এমন শুনলাম, আসলে ঘটনাটা কী? তারা সবাই এ বিষয়টি অস্বীকার করল এবং কয়েকজন আনসারী সুপারিশ করল, আর বলল, যায়েদ ছোট ছেলে তো তাই সে এ বিষয়টি ভুল বুঝেছে।

নবী করীম (সা.)ও আর বেশি কিছু জিজ্ঞাসা করেন নি। আল্লাহ্ তাআলা যখন ওহীর মাধ্যমে মহানবী (সা.)-কে জানালেন, এ ঘটনা সত্য তখন সে যুগের লোকরাও বুঝতে পারল, এ ঘটনাটি আসলেই সত্য ছিল। কুরআন করীমে এ বিষয়টি এভাবে এসেছে,

يَقُولُونَ لَئِن رَّجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ

অর্থাৎ তারা বলে, আমরা মদীনায় ফিরে গেলে সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি সবচেয়ে লাঞ্ছিত ব্যক্তিকে অবশ্যই সেখান থেকে বের করে দিবে। আসলে সব সম্মান আল্লাহ্‌র, তাঁর রাসূলের ও মু'মিনদেরই। কিন্তু মুনাফেকরা (তা) জানে না। (সূরা আল্ মুনাফেকুন-৯) এ ওহীর পর নবী করীম (সা.)-এর চেয়ে বেশি আর কে জানতে পারে, আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সলূল একজন মুনাফেক ও মিথ্যাবাদী। বরং তিনি (সা.) তার বিচক্ষণতার দ্বারা পূর্বে থেকেই জানতেন, সে মুনাফেক, কিন্তু তিনি (সা.) উপেক্ষা করে যাচ্ছিলেন। (যুদ্ধ থেকে) মদীনায় প্রবেশের পূর্বেই আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সলূলের নিষ্ঠাবান মুসলমান যুবক পুত্র নবী করীম (সা.)-কে বলে, আমি তো এমন কথা শুনলাম। আপনি যদি তাকে হত্যার ইচ্ছা রাখেন তবে আমাকে আদেশ দিন, আমি নিজেই আমার পিতার শিরচ্ছেদ করব।

কেননা কেউ যদি তাকে হত্যা করে বা কোন শাস্তি দেয় তবে হয়তো আমার অজ্ঞতার যুগের ক্রোধ পুণরায় ফিরে আসতে পারে এবং হয়তো আমি সেই ব্যক্তিকেই হত্যা করে ফেলতে পারি, যে আমার পিতাকে হত্যা করবে। এ কথা শুনে নবী করীম (সা.) বললেন, এমন কোন বিষয় নেই, আর কোন ধরণের শাস্তি দেয়ার ইচ্ছাও আমি পোষণ করছি না। বরং তোমার পিতার সাথে আমি নম্রতা ও অনুগ্রহপূর্ণ ব্যবহার করব। এমন নয় যে, কোন শাস্তি দিব বরং নম্রতা ও অনুগ্রহপূর্ণ আচরণ করব।

(সিরাতুন্ নবী, ইবনে হিশাম, গাযওয়া বণী মুস্তালেক, পৃষ্ঠা ৬৭২)

এটি সেই অভিযান ছিল যাতে হযরত আয়শা (রা.) ভুলক্রমে পিছনে রয়ে গিয়েছিলেন। কাফেলা রওয়ানা দেয়ার পর এক সাহাবী অবস্থানস্থলে অনুসন্ধান করছিলেন, কাফেলার কোন জিনিস রয়ে গেছে কিনা। তিনি যখন আয়শা (রা.)-কে দেখলেন তখন

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

পড়লেন, এ আওয়াজ শুনে তিনি রাযি আল্লাহু আনহা ঘুমন্ত অবস্থা থেকে জাগ্রত হলেন এবং নিজের উপর চাদর জড়িয়ে নিলেন। সেই সাহাবা (রা.) আয়শা (রা.)-এর পাশে তার উটটি এনে বসালেন এবং তিনি (রা.) তাতে উঠে বসলেন। পরবর্তীতে তারা যখন সেই কাফেলার সাথে মিলিত হলেন তখন সেই মুনাফেকরাই হযরত আয়শা (রা.) সম্বন্ধে বিভিন্ন ধরণের অপপ্রচার চালাতে লাগল। হযরত আয়শা (রা.)-এর উপর (নাউযুবিল্লাহ্) বাজে ধরণের অপবাদ দিল। এতে নবী করীম (সা.)-এর মাঝে কিছুটা অস্থিরতা বিরাজ করছিল। প্রকৃত পক্ষে

হযরত আয়শা (রা.)-এর উপর অপবাদ দেয়ার অর্থ ছিল নবী করীম (সা.)-এর ক্ষতি সাধন করার মত বিষয় বা চেষ্টা। এ ঘটনার পর মদীনায় পৌঁছে একদিন মহানবী (সা.) মসজিদে এসে বক্তৃতা দিলেন। এ বক্তৃতার প্রথম বাক্যটি এমন ছিল, আমাকে আমার পরিবারের বিষয়ে অনেক কষ্ট দেয়া হয়েছে। কিন্তু তিনি (সা.) মুনাফেকদের অপবাদ সহ্য করেছেন।

(বুখারী, কিতাবুল মাগাযি, হাদীস নং ৪১৪১)

তবুও তিনি (সা.) যারা এমন অপবাদ দিয়েছিল তাদেরকে তাৎক্ষনিক ভাবে কোন শাস্তি দেন নি। আর হযরত আয়শা (রা.)-এর নির্দোষ হওয়ার বিষয়ে আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে ওহী হওয়ার পরও তাদের শাস্তি দেন নি, যাদের সম্বন্ধে জানা ছিল– এরা অপবাদ লাগিয়েছে, তাদেরকেও তিনি (সা.) মার্জনা করেছেন।

একটি বর্ণনায় রয়েছে, আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সলূল যখন মারা গেল তখন তার ছেলে (যেভাবে আমি বলেছি, তিনি একজন নিষ্ঠাবান মুসলমান ছিলেন) নবী করীম (সা.)-কে বললেন, আপনি আপনার জামাটা দিলে এ জামা দিয়ে আমি আমার পিতার কাফন দিতাম। তিনি (সা.) তাঁর জামাটি দিয়ে দিলেন। বরং তাঁর (সা.) অনুগ্রহ ও মার্জনা প্রদর্শনের অবস্থা এমন ছিল যে, তিনি (সা.) তার জানাযা পড়েন এবং কবরে দোয়াও করেন।

হযরত উমর (রা.) বললেন, এ ব্যক্তি মুনাফেক আর আল্লাহ্ তাআলা মুনাফেক সম্বন্ধে বলেন, তুমি যদি তাদের জন্য ৭০ বারও ইস্তেগফার কর এবং ক্ষমা প্রার্থনা কর তবুও তারা ক্ষমা পাবে না। এ বিষয়গুলো জানার পরও আপনি এমন করলেন। উত্তরে মহানবী (সা.) বললেন, আল্লাহ্ তাআলা এতে এ অনুমতিও দিয়ে রেখেছেন তাই আমি তার জন্য ৭০ বারের বেশি ইস্তেগফার করার চেষ্টা করব। তার জন্য প্রয়োজনে আমি এরচেয়ে অধিক ক্ষমা প্রার্থনা করব।

এই ছিল নবী করীম (সা.)-এর জীবনাদর্শ যা তিনি মুনাফেকদের সাথে প্রদর্শন করেছেন।

(বুখারী, কিতাবুল জানাযা, হাদীস নং ১২৬৯)

এটা তো গেল মুনাফেক সর্দারের সাথে ক্ষমা ও মার্জনাপূর্ণ আচরণ।

এখন আমি অন্য আরো কয়েকটি উদাহরণ উপস্থাপন করছি। যেমন- মূর্খ ও অশিক্ষিত বেদুঈন, যাদের মধ্যে কোন প্রকার ভদ্রতা ছিল না এবং যারা নবী করীম (সা.)-এর মর্যাদা সম্পর্কে কোন জ্ঞান রাখত না। এদের সাথে মহানবী (সা.)-এর মার্জনাপূর্ণ আচরণ সম্বন্ধে একটি বর্ণনায় এসেছে, হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেন, আমি নবী করীম (সা.)-এর সাথে ছিলাম। তিনি (সা.) মোটা পাড় ওয়ালা একটি চাদর গায়ে জড়িয়ে রেখেছিলেন। এক বেদুঈন তাঁর চাদরটি এতো জোরে টেনে ধরে যে মহানবী (সা.)-এর ঘাড়ে পাড়ের দাগ পরে যায়।

এরপর সে বলে, হে মুহাম্মদ (সা.)! আল্লাহ্ তাআলা আপনাকে যে সম্পদ দান করেছেন সেখান থেকে আপনি আমাকে দুটি উট দিন। আপনি তো আমাকে আপনার নিজের বা আপনার বাপ-দাদার কোন সম্পদ দিচ্ছেন না। তার এমন শক্ত কথা শোনার পর মহানবী (সা.) কিছুক্ষণ চুপ থাকলেন এবং এরপর বললেন,

المال مال الله و انا عبده

সম্পদ তো আল্লাহ্‌রই কিন্তু আমি আল্লাহ্‌র বান্দা। অতঃপর নবী করীম (সা.) বললেন, তুমি আমাকে যে কষ্ট দিয়েছো সেটার প্রতিশোধ নেয়া হবে। বেদুঈন বলল, আমার কাছ থেকে প্রতিশোধ নেয়া হবে না। নবী করীম (সা.) বললেন, তোমার কাছ থেকে কেন প্রতিশোধ নেয়া হবে না? সেই বেদুঈন বলল, কেননা আপনি মন্দের প্রতিশোধ মন্দ দ্বারা গ্রহণ করেন না।

তার এ কথা শুনে নবী করীম (সা.) হেসে ফেললেন। এটাই ছিল সেই নম্র ব্যবহার যার আরেক নাম মার্জনা। এ বিষয়টি-ই মানুষের মাঝে যা খুশি করার সাহসের সঞ্চার করেছিল। মহানবী (সা.) বললেন, তার চাওয়া উট দুটির একটিতে যব এবং অন্যটিতে খেজুর তুলে তাকে দিয়ে দাও।

(আশ্‌শেফা, কাযী আইয়ায, বাব সানী, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৭৪)

এখন আমি ইসলাম বিরোধীদের সাথে নবী করীম (সা.)-এর মার্জনাপূর্ণ আচরণের কয়েকটি দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করব।

হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেছেন, মক্কার কুরাইশদের মধ্য থেকে আশি জন লোক ফযরের নামযের সময় জাবলে তানীম থেকে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর উপর অতর্কিত আক্রমণ করে। তাদের উদ্দেশ্য ছিল, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) কে হত্যা করা। কিন্তু তাদের গ্রেফতার করা হয়। পরবর্তীতে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তাদের ক্ষমা করে ছেড়ে দেন। (সুনান তিরমিযী, কিতাবুত্ তফসীর হাদিস নং ৩২৬৪)

এখন এমন কয়েকটি ক্ষমার উদাহরণ উপস্থাপন করব যারা যুদ্ধাপরাধী ছিল। কিন্তু মূর্তিমান অনুগ্রহ ও মার্জনা প্রদানকারী সত্তা তাদেরকেও ক্ষমা করছেন এবং বলেছেন, যাও তোমাদের জন্য কোন ভর্ৎসনা ও শাস্তি নেই। আরেকটি বর্ণনায় রয়েছে, হিশাম বিন যায়েদ বিন আনাস বলেন, আমি আনাস বিন মালেক (রা.) কে বলতে শুনেছি, একবার এক ইহুদি নবী করীম (সা.)-এর পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় السلام عليكم -এর পরিবর্তে বলল السام عليكم অর্থাৎ তুমি ধ্বংস হও। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) সাহাবাদের উদ্দেশ্য করে বললেন, তোমরা কি বুঝতে পেরেছ সে কি বলেছে? অতঃপর নবী করীম (সা.) বললেন, সে السام عليكم বলেছে। সাহাবিগণ ইহুদির এমন আচরণ দেখে বললেন, আমরা কি তাকে হত্যা করব না? মহানবী (সা.) বললেন, না তোমরা তাকে হত্যা করবে না।

(বুখারী, কিতাবুল ইসতেতাবাতিল মুরতাদীন, হাদীস নং ৬৯২৬)

তিনি (সা.) এ শিক্ষাও দিলেন যে, আমার অনুগ্রহ কেবল নিজেদের জন্য নয় বরং আমার উপর যারা অত্যাচার করে তাদের জন্যও। শাস্তি শুধু এমন অপরাধীদের জন্য প্রযোজ্য হবে যাদের ব্যাপারে আল্লাহ্ তাআলা শাস্তি নির্ধারিত করে রেখেছেন। যাদের সম্পর্কে কুরআন করীমে সুস্পষ্ট আদেশ রয়েছে অথবা যাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তাঁকে (সা.) জানিয়েছেন।

একবার এক ইহুদি মহিলা মাংসের সাথে বিষ মিশিয়ে মহানবী (সা.) ও তাঁর সাহাবীদের (রা.) খাওয়ানোর চেষ্টা করেছিল।

অপরাধ স্বীকারের পরও তিনি (সা.) তাকে ক্ষমা করে দেন। সাহাবীগণ রাগান্বিত হয়ে অনুমতি চেয়েছিলেন, 'আমরা তাকে হত্যা করি'? মহানবী (সা.) বললেন, না, কোন ক্রমেই না।

(বুখারী, কিতাবুল হিবাহ্, বাব কবুলুল হাদীয়া মিনাল মুশরেকীন, হাদীস নং ২৬১৭)

ওয়াহশী, যে হযরত হামযা (রা.)-কে ওহুদের যুদ্ধে শহীদ করেছিল সে বলে, হামযা (রা.)-কে শহীদ করার পর আমি মক্কায় ফিরে এসে। মক্কাতেই জীবনযাপন করতে থাকি। পরে মক্কার চতুর্দিকে ইসলাম ছড়িয়ে পড়লে আমি তায়েফ চলে গেলাম। তায়েফবাসী রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কাছে তাদের প্রতিনিধি দল পাঠালো এবং আমাকে বলল, মহানবী (সা.) মুখপাত্রদের কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করেন না। কাজেই আমিও প্রতিনিধি দলের সাথে যোগ দিলাম, এমনকি রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর খেদমতে উপস্থিত হলাম।

নবী করীম (সা.) আমাকে দেখে বললেন, তুমি কি ওয়াহশী? আমি বললাম হ্যা আমি ওয়াহশী। নবী করীম (সা.) বললেন, তুমি-ই কি হামযা (রা.) কে হত্যা করেছিলে? আমি বললাম, আপনি যেমনটি শুনেছেন ঘটনা তেমনই। সে বলে, মহানবী (সা.) আমার দোষ-ত্রুটি ক্ষমা করে দিয়ে বললেন, আমার সামনে না আসাটা কি তোমার জন্য সম্ভব? মহানবী (সা.)-এর এ কথার পর আমি মদীনা থেকে চলে আসি।

(বুখারী কিতাবুল মাগাযী হাদীস নং, ৪০৭২)

নবী করীম (সা.)-এর চরম মার্জনা সম্পর্কে আরো বেশি জানা যায় যখন নবী করীম (সা.) ওয়াহশীকে হযরত হামযা (রা.) কে শহীদ করার ব্যাপারে অধিক জিজ্ঞাসা করেন, কিভাবে শহীদ করেছিলে এবং এরপর কি কি করেছিলে? সাহাবাগণ (রা.) বলেন, তখন নবী করীম (সা.)-এর চোখ থেকে অশ্রু ঝড়ছিল।

নিশ্চয় স্বীয় চাচার স্মৃতি তাজা হওয়ায় এ অশ্রু প্রবাহিত হয়েছিল। সেই চাচা যিনি আবু জেহেলের বিরুদ্ধে তাঁর (সা.) সঙ্গ দিয়েছিলেন এবং তাঁর (সা.) পক্ষে দাঁড়িয়ে ছিলেন। কিন্তু হযরত হামযা (রা.)-এর হত্যাকান্ডে প্রধান ভূমিকা রাখার পরও মহানবী (সা.) অনুগ্রহ ও মার্জনা করে সেই ওয়াহশীকে পর্যন্ত ক্ষমা করে দিলেন। (আল কামেল ফী তারিখ ইবনে আছির, ফাতাহ্ মাক্কা, পৃষ্ঠা ২৫৮)

মক্কা বিজয়ের পর নবী করীম (সা.) ইকরামা বিন আবু জেহেলকে হত্যার আদেশ দিয়েছিলেন। কেননা সে ও তার পিতা নবী করীম (সা.) ও মুসলমানদের কষ্ট দেয়ার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি কঠোরতা অবলম্বন করত। ইকরামা যখন শুনল মহানবী (সা.) তাকে হত্যার আদেশ জারি করেছেন তখন সে ইয়েমেন-এর দিকে পলায়ন করল।

তার পিছনে পিছনে তার স্ত্রী, যে ছিল তার চাচাতো বোন এবং হারেস বিন হিশামের মেয়ে। সে ইসলাম গ্রহণ করার পর তার খোঁজে গিয়েছিল এবং তাকে সমুদ্র তীরে জাহাজের জন্য অপেক্ষা রত পেয়ে ছিল। একটি বর্ণনায় রয়েছে, ইকরামাকে তার স্ত্রী জাহাজে আরোহণ করা অবস্থায় পায় এবং তার সাথে কথা বলার পর সে ফিরে আসে।

তার স্ত্রী তাকে বলে, হে আমার চাচার ছেলে! আমি তোমার কাছে সবচেয়ে বেশি আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষাকারী, সর্বোত্তম অচরণের অধিকারী এবং সর্বোত্তম ব্যক্তির পক্ষ থেকে এসেছি, তুমি তোমার নিজ সত্তাকে ধ্বংস করো না। আমি তোমার জন্য নিরাপত্তার বার্তা নিয়ে এসেছি। ফিরে চল, নবী করীম (সা.) তোমাকে ক্ষমা করে দিবেন এবং কিছুই বলবেন না।

ইকরামা তার স্ত্রীর সাথে ফিরে এসে জিজ্ঞেস করল, হে মুহাম্মদ (সা.)! আমার স্ত্রী আমাকে বলেছে, আপনি আমাকে নিরাপত্তা দান করেছেন। মহানবী (সা.) বললেন, সে ঠিক বলেছে, তোমাকে নিরাপত্তা দেয়া হয়েছে। এ কথা শোনা মাত্র ইকরামা বলল,

اشهد ان لا اله الا الله وحده لا
شريك له و انك عبده و رسوله

অর্থাৎ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ভিন্ন কোন উপাস্য নেই এবং নিশ্চয় আপনি তাঁর বান্দা ও রাসূল। অতঃপর লজ্জায় ইকরামা তার মাথা হেট করে রইল। এ অবস্থায় নবী করীম (সা.) বললেন, হে ইকরামা! তুমি যদি আমার কাছে এমন কিছু চাও যা আমার সাধ্যের মধ্যে রয়েছে তবে আমি তা তোমাকে দিব। ইকরামা বলল, আপনি আমার সেই সব কঠোরতা ক্ষমা করে দিন যা আমি আপনার সাথে করেছি। এ কথা শুনে নবী করীম (সা.) দোয়া করলেন,

اللهم اغفر لعكرمة كل عداوة
عادانيها و منطق تكلم به

অর্থাৎ হে আমার খোদা! আমার সাথে করা ইকরামার প্রতিটি কঠোরতা তুমি ক্ষমা করে দাও। অথবা তিনি (সা.) বলেছিলেন, হে আল্লাহ্ ! ইকরামা আমার সম্বন্ধে যা কিছু বলেছে তা তুমি ক্ষমা করে দাও। এ ধরণের ক্ষমার আর কোন দৃষ্টান্ত রয়েছে কি? (اللهم صل علي محمد و

علي ال محمد و بارك
و سلم انك حميد مجيد

(সিরাতুল হালবিয়া, আল্লামা আবুল ফরজ নুরুদ্দীন, যিকরে ফাতাহ্ মক্কা, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা ১৩২)

মক্কা বিজয়ের সময় নবী করীম (সা.) যখন কাবা শরীফ তোয়াফ করছিলেন তখন ফুযালা বিন হুমায়ের নামের এক ব্যক্তি মহানবী (সা.) কে হত্যা করার মানসে তাঁর কাছে আসে।

আল্লাহ্ তাআলা তার উদ্দেশ্য সম্পর্কে নবী করীম (সা.) কে অবগত করেন। তিনি (সা.) তাকে ডাকেন, ডাকার পর সে ভয় পেয়ে যায়। অতঃপর তিনি (সা.) তাকে জিজ্ঞাসা করেন, কি উদ্দেশ্যে এসেছো? জানা কথা যে ধরা পরার পর সে মিথ্যা বলবে, তাই সে বাহানা বানাতে থাকে।

নবী করীম (সা.) মুচকি হেসে আদর করে নিজের কাছে ডাকলেন এবং তার বুকে নির্ভয়ে নিজ হাত রাখলেন। এটা জানার পরও যে সে কি উদ্দেশ্যে এসেছে এবং তার কাছে অস্ত্রও আছে। ফুযালা বলে, মহানবী (সা.) যখন তাঁর হাত আমার বুকে রাখলেন তখন আমার সব ঘৃণা দূর হয়ে গেল। যে সত্তাকে হত্যার উদ্দেশ্যে বেরিয়েছিলাম তাঁর এ অনুগ্রহপূর্ণ হাত আমার মনে তাঁর জন্য ভালবাসার সমুদ্র প্রবাহিত করল।

(সিরাতুন নবুবীয়াহ্, ইবনে হিশাম, পৃষ্ঠা ৭৪৭)

অতএব, এই হল- নিজের শত্রুর সাথে আমার নেতার আচরণ। অপরাধী ধরা পড়ার পরও তাকে শাস্তির পরিবর্তে ভালবাসার তীর দিয়ে এমন ভাবে ঘায়েল করতেন যে, সে তাঁর জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করা জন্য প্রস্তুত হয়ে যেত। এমন কি কেউ আছে যে এই অনুগ্রহ ও মার্জনার মোকাবেলা করতে পারে?

আল্লাহ্ তাআলার এ আদেশ সর্বদা আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে, 'মুহাম্মদ (সা.) তোমাদের জন্য সর্বোত্তম জীবনাদর্শ। কাজেই বর্তমান যুগের মুসলমানদেরও সেই আদর্শের অনুসরণের প্রতি মনোযোগী হওয়া প্রয়োজন। হায়! যদি তারা বুঝত।

উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়শা (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) কে যখনই দুটি বিষয়ের মধ্যে থেকে কোন একটিকে বেছে নেয়ার অনুমতি দেয়া হয়েছে তখনই তিনি সে দুটির মধ্যে থেকে সহজতরটি বেছে নিতেনআর গ্রহণ করতেন কেবল সেটা যা গ্রহণ করলে কোন পাপ হয় না। আর যেটা গ্রহণ করলে পাপ হয় সেটা থেকে তিনি সবার চেয়ে দূরে থাকতেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) নিজের সত্তার জন্য কারো কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করেন নি। কিন্তু কেউ যদি অন্যায় পন্থায় আল্লাহ্ তাআলা নির্ধারিত সীমা রেখা লঙ্ঘন করত তবে তিনি (সা.) তাকে আল্লাহ্ তাআলার খাতিরে শাস্তি দিতেন।

(বুখারী, কিতাবুল মানাকেব, হাদীস নং ৩৫৬০)

হযরত উমর (রা.) সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে, 'একবার তিনি আলাপচারিতার ফাঁকে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে বললেন, হে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)! আমার পিতামাতা আপনার জন্য কুরবান হোন। হযরত নূহ (আ.) তাঁর জাতির বিরুদ্ধে বদ-দোয়া করেছিলেন,

رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ
مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا

অর্থাৎ হে আমার প্রভূ-প্রতিপালক! এ ধরা পৃষ্ঠে কাফেরদের কোন গৃহবাসীকেই তুমি রেহাই দিও না।

(সূরা নূহ-২৭)

হে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)! আপনি যদি আমাদের জন্য নূহের মত বদ-দোয়া করতেন তবে আমরা সবাই ধ্বংস হয়ে যেতাম। আপনার কোমরে ব্যথা দেয়া হয়েছে, আপনার পবিত্র মুখমন্ডলকে রক্তাক্ত করা হয়েছে, আপনার সামনের দিকের দাঁত শহীদ করা হয়েছে কিন্তু আপনি শুধু কল্যাণের কথা বলেছেন এবং এ দোয়া করেছেন,

اللهم اغفر لقومى فانهم لا يعلمون

অর্থাৎ হে খোদা! আমার জাতিকে ক্ষমা কর, তারা কি করছে তা তারা জানে না।'

(আশ্‌শেফা, কাজী আইয়ায, প্রথম খন্ড, পৃষ্ঠা ৭৩)

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন, 'হযরত খাতামুল আম্বিয়া (সা.) মক্কাবাসী ও অন্যদের বিরুদ্ধে পরিপূর্ণ বিজয় অর্জনের পর এবং তাদের তাঁর তরবারির নিচে দেখার পর তাদের পাপ ক্ষমা করে দিয়েছেন। কেবল গুটি কয়েক সে সব ব্যক্তিকেই শাস্তি দিয়েছিলেন যাদের শাস্তি দেয়ার জন্য অদ্বিতীয় খোদার পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট আদেশ দেয়া হয়েছিল। সেই সব অতি নিকৃষ্ট অভিশপ্তরা ব্যতীত অন্য সব শত্রুর পাপ তিনি ক্ষমা করে দিয়েছেন। আর বিজয়ী হওয়ার পর

لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ

অর্থাৎ আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই।

(সূরা ইউসূফ-৯৩)

এ অপরাধ মার্জনার ব্যাপারে বিরুদ্ধবাদীদের কাছে যে বিষয়টি অসম্ভব মনে হতো এবং নিজেদের দুষ্টামির প্রতি দৃষ্টি দিয়ে তাদের নিজেদেরকে প্রতিপক্ষের হাতে সমর্পিত অবস্থায় দেখে মৃত্যুদণ্ডই যুক্তিসম্মত মনে করত, এমন হাজারো মানুষ এক মুহূর্তের মধ্যে ইসলাম ধর্ম কবুল করল।'

(বারাহীনে আহমদীয়া, ৪র্থ খন্ড, রূহানী খাযায়েন, প্রথম খন্ড, পৃষ্ঠা ২৮৬-২৮৭)

অতএব, এ হল নবী করীম (সা.)-এর মার্জনা, যা বিরোধিদের কাছে বাহ্যিক ভাবে অনেক কঠিন বিষয় ছিল। এ ধরণের মার্জনাও করা সম্ভব! কিন্তু তারা যখন নবী করীম (সা.) কাছ থেকে এমন উত্তম আচরণ প্রত্যক্ষ করল তখন এর এমন ফলাফল হল যে, বিরোধীরাও ইসলাম গ্রহণ করল।

হায়! যদি বর্তমান যুগের মুসলমানরাও এ বিষয়টি অনুধাবন করত, তবে ইসলামের এ বাণী আরো অনেক উন্নতি লাভ করত। হায়! যদি এ সব লোক সন্ত্রাসবাদী গোত্রের থাবা থেকে বের হয়ে এই জীবনাদর্শের কথা ভাবত, যে আদর্শ আমাদের নেতা ও অভিভাবক হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.) আমাদের জন্য রেখে গিয়েছেন।

আল্লাহ্ তাআলা তাদের জ্ঞান দান করুন, আমীন।

অনুবাদ:
মওলানা মোহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী
প্রিন্সিপাল, জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ।

To Watch Friday Sermon Regularly

Please visit: www.alislam.org

www.ahmadiyyabangla.org;www.mta.tv